কুৎসিত হাঁস শিল্পীর সংগ্রাম

রমানাথ রায়

রূপকথা চিরনতুন, সৌন্দর্যের এক অফুরন্ত খনি। রূপকথা আমাদের এমন এক মায়াবী জগতে নিয়ে যায়,যেখানে বাস্তব - অবাস্তবের প্রশ্ন ওঠে না, সম্ভব - অসম্ভবের ভেদ ঘুচে যায়, লৌকিক - অলৌকিক মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকে। যুগ যুগ ধরে সব দেশের সব বয়সের মানুষ রূপকথার পৃথিবীর জন্যে এক অদ্ভুত আকর্ষণ বোধ করে।কেন করে? কী আছে এর মধ্যে? একি শুধু গল্পের টান? নাকি এর মধ্যে লুকিয়ে থাকে মানব জীবনের পরম সত্য,যা কোনোকালেই মিথ্যে হয়ে যায় না? মনে হয় দুটোই সত্যি। ছোট বয়সের ছেলেমেয়েরা রূপকথার মধ্যে পায় গল্প পড়ার আনন্দ। আর বয়স্কমানুষেরা শুধু গল্প পড়ার আনন্দ নয়, রূপকথার মধ্যে খুঁজে পায় জীবনের অন্য অর্থ। এইসব রূপকথা কারা রচনা করেছিলেন, কেউ তা জানে না। অথচ সব দেশেই রূপকথা তৈরি হয়েছে। হয়ত ঠাকুর্দ-ঠাকুমারা ছোট ছোট নাতি - নাতনিদের জনেই তৈরি করেছিলেন এইসব গল্প। তারপর তা মুখে মুখে নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। তারপর লিখিত - সাহিত্যের দাপটে এই গল্পগুলো বিস্মৃতির অন্ধকারে চলে গিয়েছিল। তবে কপাল ভাল। আবার সেইসব হারিয়ে যাওয়া অমুল্য গল্পগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে, লিপিবদ্ধ হয়েছে, সংকলিত হয়েছে। আমাদের দেশে এই কাজ বিদেশেও এরকম অনেকে আছেন। এঁদের মধ্যে গ্রিম ভাইরা এই কাজের জন্যে অমর হয়ে আছেন। এবং তাঁর সঙ্গে অমর হয়ে আছেন শার্ল পেরো, যাঁর জন্যে আমরা পেয়েছি সিণ্ডেরেলার মতো আশর্চ্য গল্প। শুধু সংকলন নয়, নতুন করে রূপকথাও আবার লেখা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে সবার সেরা হান্স ত্রিস্টিয়ান এ্যাণ্ডারসান। অবশ্য তাঁর পাশে আর একজনের নাম করতেই হয়। তিনি অস্কার ওয়াইল্ড।

।।দুই।।

১৮০৫ সালে ডেনমার্কের ওডেন্স শহরে হান্স ত্রিস্টিয়ান এ্যাণ্ডারসণের জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন মুচি, মা ছিলেন ধোপানি। সংসারে আয় বলতে তেমন কিছু ছিল না। ফলে তাঁর শৈশব এবং বাল্যকাল কেটেছে অসম্ভব দারিদ্রের মধ্যে। এই দারিদ্রের ভয়াবহ রূপ আমরা 'দেশলাই বিক্রি করে ছোট্ট মেয়ে' গল্পে দেখতে পাই। এ্যাণ্ডাসেনের বাবার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। এ্যাণ্ডারসেনের বয়স বারো হবার আগেই তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। এ্যান্ডারসেন লেখাপড়া ছেড়ে পুতুল নাচিয়েদের দলে ভিড়ে যান। তারপর চোদ্দ বছর বয়সে তিনি ওডেন্স ছেড়ে চলে যান কোপেনহাগেন-এ। সেখানে তাঁকে সহায় - সম্বলহীন হয়ে অনাহারে দিন কাটাতে হয়। তবে তা বেশিদিনের জন্য নয়। কথায় বলেভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়। তাই এইসময় তিনি কয়েকজন বন্ধুর দেখা পান। তাঁরা ষষ্ঠ রাজা ফ্রেডরিকদের বলে তাঁকে গ্রামার স্কুলে ভর্তি করে দেন। কিন্তু তাঁর ঝোঁক লেখাপড়ায় ছিল না। তাঁর ঝোঁক ছিল সাহিত্যরচনায়। তাঁরলেখকজীবন শু হয় বাল্যকাল থেকে। শু হয় কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে। তারপর সারাজীবন ধরে লিখেছেন বড়দের জন্যে অজস্র গল্প, উপন্যাস, নাটক। তবে এসব রচনার জন্যে কেউ তাঁকে মনে রাখেনি। তাঁকে সারা পৃথিবীর মানুষ মনে রেখেছে ছোটদের জন্য লেখা তাঁর আশর্চ্য সুন্দর সব রূপকথার জন্যে। এই গল্পগুলো ছোটদের জন্যে লেখা হলেও এর পাঠক কিন্তু সব বয়সের মানুষ। এই গল্পগুলো কোনোদিন পুরনো হবে না, কোনোদিন এদের সৌন্দর্যম্লান হবে না। একবার পড়লে এসব গল্প আমাদের মনে চিরকালের মতো গাঁথা হয়ে যায়। এ্যাণ্ডারসনের নাম করলেই আমাদের মনে পড়ে 'দেশলাই বিক্রি করে ছোট্ট মেয়ে'-র কথা, মনে পড়ে 'কুৎসিত হাঁস' - এর কথা। কে ভুলতে পারে 'রাজার নতুন পোশাক' বা 'লাল জুতো' বা 'তুষার রানি' বা 'মৎস কন্যা'র মতো অনবদ্য সব

গল্পের কথা?এইগল্পগুলো প্রকাশিত হতে থাকে ১৮৩৫ সাল থেকে। এ্যাণ্ডারসেনের বয়স তখন তিরিশ। তাঁর শেষ র পকথার বই প্রকাশিত হ ১৮৭২ সালে। তখন তাঁর বয়স সাতষট্টি। এরপর মাত্র তিন বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। ১৮৭৫ স ালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে সারা পৃথিবীর মানুষ এই হত দরিদ্র মুচির ছেলের জন্যে শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, তাঁর জন্মের দুশো বছর পরে আজও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সব বয়সের মানুষের কাছে তিনি একান্ত আপনজন।

।। তিন ।।

এ্যান্ডারসনের অধিকাংশ গল্প শুধু নিজস্ব অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ নয়, গভীর অর্থে সমুজ্জ্বল। তাঁর বাল্যকাল যে তীব্র অভাব - অনটনের মধ্যে কেটেছে তার মর্মান্তিক রূপ যেমন দেখতে পাই 'দেশলাই বিক্রি করে ছোট্ট মেয়ে'র মধ্যে, তেমনি পাশাপাশি সংসার ও সমাজ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ছড়িয়ে আছে 'কুৎসিত হাঁস' গল্পে। এই গল্প কেবলমাত্র কুৎসিত হাঁসের রাজহঁ াস হয়ে ওঠার গল্প নয়, আসলে এ গল্প এক মুচির ছেলের এ্যাণ্ডারসন হয়ে ওঠার গল্প। কী ভীষণ দুঃখ কষ্ট অপমান ও ল াঞ্ছনার ভিতর দিয়ে মুচির ছেলে এ্যাণ্ডারসন লেখক এ্যাণ্ডারসন হয়ে উঠেছিলেন, তা এখানে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই। অথচ এই গল্পে কোনো তিক্ততা নেই, কারো কোনো রাগ নেই, অভিমান নেই। এ্যাণ্ডারসন অনেকটা যেন আমাদের বিভূতিভূষণের মতো, কিংবা বলা যায় মোৎসার্টের মতো। সারাজীবন মোৎসার্ট তাঁর কালের প্রতিভাহীন মানুষদের সঙ্কীর্ণতায়, নীচতায় ঈর্ষাকাতরতায় বিব্রত হয়েছেন,দারিদ্র ও অস্বাস্থ্য তাঁকে কোনোদিন শান্তি দেয়নি, এমনকী অ ার্চবিশপের বন্ধুর লাথি পর্যন্ত খেয়েছিলেন। অথচ কী আশ্চর্য শান্ত স্নিগ্ধ তাঁর সঙ্গীত। কোথাও তাঁর সঙ্গীতে বিটোফেনের তীব্রতা নেই, ক্রোধ নেই, অস্থিরতা নেই, কিংবা নেই ভাগ্যের টুঁটি চেপে ধরার মানসিকতা। এ্যান্ডারসেনের 'কুৎসিত হাঁস' মোৎসার্টের সঙ্গীতের মতোই শান্ত সুন্দরএকটি গল্প। অথচ এইগল্পের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এক পরম সত্য, যা কোনোদিন মিথ্যে হবে না, পুরনোও হবে না। একজন লেখক, শিল্পী বা প্রতিভাবানের ওপর তার পরিবারের মানুষেরা কত নিষ্ঠুর অ াচরণ করতে পারে, কত হৃদয়হীন আক্রমণ চালাতে পারে, এই গল্প যেন তারই ছবি। এই গল্প যেন ইশারায় বলতে চায়, স াধারণ মানুষের মধ্যে অসাধারণ হয়ে জন্মানো অপরাধ। জন্মালে অসাধারণদের কষ্ট পেতেই হবে। এটা যেন তার নিয়তি। কুৎসিত হাঁসের কোনো অপরাধ ছিলনা । রাজহাঁসের ডিম হয়ে সে পাতিহাঁসের ডিমের মধ্যে মিশে ছিল। আর সেটাই ত ার কাল হয়ে দাঁড়াল। তার জীবনে অপমান ও লাঞ্ছনার শু হল এখান থেকেই। পাতিহাঁসের ডিমগুলো একে একে ফুটতে লাগল। ডিমের খোলস ভেঙে বেরিয়ে এল ফুটফুটে ছানারা কিন্তু রাজহাঁসের ডিমটা বেঢপ, অন্য ডিমের মতো নয়, মা বলে, 'কী মুশকিলে পড়েছি এই একটা ডিম নিয়ে'। পাড়ার বুড়ি হাঁস বলে, 'কেমন যেন ঠেকছে---বন - মুরগির ডিম কিনা কে জানে!' তারপর একদিন ডিম ফুটলো ফুটতেই মা বলল, আর কারো মতোই তো ও দেখতে হয়নি'। আর এটাই হল ত ারঅপরাধ। কেন ও আর কারো মতো নয়? তবু মার সান্ত্বনা, বাঁচা গেলো, ওটা বন মুরগির ডিম নয় তাহলে।' নিজেরব াচচা মনে করে মায়ের একটা সহানুভূতি থেকে যায় এই কুৎসিত হাঁসের ওপর। ভাবে, 'ঠিকমতো দেখলে এমন কুৎসিতই ব া কী? বেশ তো সুন্দর'। কিন্তু আশেপাশের হাঁসের দল এই কুৎসিত হাঁসটাকে ছাড়বে কেন? একটা হাঁস কুৎসিত বাচচা হঁ াসটার ঘাড় কামড়ে দিল। মা এতে রেগে গেল সে বলল, 'কী বিশ্রী বে-আন্দাজি চেহারা ওর। ওটাকেআমরা তাড়িয়ে ছ াড়ব।' মোড়ল বুড়ি হাঁস বলল, 'ওকে এখন বদলে নিতে পারো না?' মা তখন বাচচার হয়ে বলল,'ও সুন্দর নাইবা হলো, ওর স্বভাবটা ভারি ভাল।' তবু অন্য হাঁসেরা বাচচাটাকে ছাড়েনা। 'সবাই তাকে দুয়ো দেয়, ধাক্কা দেয়, কামড়ে দেয়।' এমনকী মুরগিরাও তাকে রেহাই দেয়না। এক জবরদস্ত মুরগি তাকে 'বেঢপ কোঁৎকা কোথাকার' বলে তেড়ে আসে। কুৎসিত হাঁস এই অসহ্য অপমান ও লাঞ্ছনার প্রতিবাদ করে না।কারণ 'বেচারা বাচচা তো ভয়েই জড়োসড়ো ; কোনদিকে তাকাবে, বসবে না দাঁড়াবে কিছু ঠিক করতে পারল না।' সে শুধু মন খারাপ করে পড়ে থাকে। দিন দিন তার অবস্থা আরো খারাপ হতে থাকে। তাকে দেখলেই সবাই দূর দূরকরে তেড়ে মারতে আসে! আর ভাইবোনেরা পর্যন্ত চটে গিয়ে বলে, 'বেড়ালেও তোকে দেখেনা, অলুক্ষুণে।' আর তার মাও শেষ পর্যন্ত ধৈর্য হারিয়ে বলে বসল 'ওটা দূরে গেলেও বাঁচতুম।' কুৎসিত হাঁস সব বুঝতে পারে। বুঝতে পেরেও চুপ করে থাকে। 'অন্য হাঁসেরা তাকে কামড়ায়, মুরগিরা ওকে খোঁচায়। অ ার যে - মেয়েটা ওকে রোজ খাওয়াতে আসে, সে তো একদিনওর গায় লাথি দিয়েই চলে গেলো।' এর পরেও কি এই পরিবারের মধ্যে থাকা যায়? থাকা সম্ভব? কুৎসিত হাঁস তাই এই হৃদয়হীন পরিবার ছেড়ে একদিন চলে গেল। চলে গেল

স্বাধীনভাবে নিজের মতো করে বাঁচতে। সব শিল্পী তাই চায়।

।। চার ।।

বহুকাল আগে অঁদ্রে জিদ লিখেছিলেন, 'Families, I hate you', শুধু তাই নয়, তিনি আরো লিখেছিলেন, 'There is nothing more dangerous for you than your family, your own room, your own past....you must leave them.' কুন্দেরা তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন, ইবসেন, স্ট্রিণ্ডবার্গ, জয়েস, সেফেরিস একথা জানতেন। আর জানতেন বলেই 'They spent a large part of their lives abroad, away from family's power.' এই প্রসঙ্গে হয়তো অনেকের কাফকার কথা মনে পড়বে। বেকেটের কথা মনে পড়বে। কারণ, তাঁরাও বাড়িছেড়েছিলেন। ১৮৯৬ সালে অঁদ্রে জিদ তাঁর বিখ্যাত জার্নালে লিখছেন, 'my whole soul longs for that nomadic state.' তারপর তিনি জানাচ্ছেন, 'I do not find a single word of Christ that strengthens, or even authorizes, the family and marriage.' যিশু খ্রিস্ট স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'he that loveth father or mother more than me is not worthy of me.' ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কি এরকম কথাই বলেন নি? কথামৃত-র অমর লেখক মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে দ্বিতীয়বার দর্শনের দিন ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন তাঁর বিয়ে হয়েছে কিনা। মহেন্দ্রনাথ উত্তরে বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর ভাইপোকে ডেকে সবিস্ময়ে বললেন, 'ওরে রামলালা, যাঃ বিয়ে করে ফেলেছে।' অর্থাৎ বিয়ে করলে জাগতিক স্তরের ওপরে ওঠা সম্ভব নয়। সংসারে আটকে গেলে মানুষের দায়বদ্ধতা থাকে বাবা-মার ওপর, স্ত্রী ও সন্তানদের ওপর। তাদের দেখভাল করতে করতেই পুষ নিঃশেষিত হয়, ধ্বংস হয়। তার আর বাইরের পৃথিবীকে দেবার কিছু থাকে না। পরিবার তাকে শোষণ করে, ছিবড়ে করে ফেলে দেয়। একটা পরিবার যে কত নিষ্ঠুর হতে পারে, কত ভয়াবহ হতে পারে, তার উজ্জ্বল উদাহরণ তলস্তয়ের বিখ্যাত কাহিনি 'ইভান ইলিচের মৃত্যু' কিংবা কাফকার 'রূপান্তর' গল্প। ইভান ইলিচ এবং গ্রেগর সামসা তাদের পরিবারের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্যে নিজেদের উৎসর্গ করেছিল। কিন্তু বিনিময়ে কী পেল তারা? মৃত্যুর সময় একটি প্রাণীর কাছ থেকেও এক ফোঁটা চোখের জল দূর থাক, সামান্য সহানুভূতিও পেল না। বরং তার মৃত্যুতে তাদের পরিবারের লোকজন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এই হচ্ছে আমাদের পরিবার । আমরা এর মধ্যেই থাকি। কাফকার ডায়েরি থেকে জানতে পারি তিনি মাকে একদিন বলছেন, 'You are all strangers to me, we are all related only by blood,' তাঁর ডায়েরি থেকে আরো জানতে পারি যে তিনি মার সঙ্গে প্রতিদিন কথাবার্তায় গড়ে কুড়িটার বেশি শব্দ খরচ করতেন না। বাবার সঙ্গে 'হ্যালো' ছাড়া আর কিছু বলতেন না। আর বিবাহিত বোনেদের সঙ্গে এবং তাদের স্বামীদের সঙ্গেও একটা কথা বলতেন না। কারণ, তাঁদের সঙ্গে কথা বলার মতো বিষয় তিনি খুঁজে পেতেন না। তাঁর অবস্থাটা কান্টের মতো। কান্ট কোনোদিন তাঁর বোনেদের সঙ্গে দেখা করতে যাননি। তিনি বলতেন, তাদের বলার মতো কোনো কথা তাঁর নেই। তিনি তাই পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধুমাত্র এক ভৃত্যকে নিয়ে সারা জীবন কাটিয়েছেন। তাঁর লাঞ্চের আসরে ছাত্র, অধ্যাপক, নেতা, ডাক্তাররা আসতে পারতেন। কিন্তু সেইসব আসর ছিল নারীবর্জিত। তিনি কোনোদিন কোনো নারীকে লাঞ্চে আমন্ত্রণ করেননি। তিনি কি নারীদের বিপজ্জনক সামগ্রী বলে মনে করতেন? মনে করতেন পুষের জীবনের সমস্ত অশান্তির উৎস নারী? মনে করতেন শরীর ছাড়া নারীদের দেবার কিছু নেই? তাই কি তিনি সারাজীবন অবিবাহিত ছিলেন? এ্যান্ড্রারসনও কি এই কারণেই সারাজীবন অবিবাহিত থেকে গেলেন? আমি এর উত্তর জানিনা। তবে আজকাল একটা কথা অনেকে বলে, বিশেষ করে মেয়েরা। তারা বলে, সমস্ত সফল পুষের পিছনে নাকি একজন নারী থাকে। এর মতো ভুল কথা, মিথ্যে কথা আর হতে পারে না। বরং বলা যায় প্রত্যেক নষ্ট বা ব্যর্থ পুষের পিছেন থাকে এক বা একাধিক নারী। নারী মাত্রই চায় সংসার, চায় পরিবার। পুষকে সেই পরিবার সৃষ্টিতে নারী কাজে লাগায়, নারীর শরীরের মোহে পুষ সংসারের আবর্তে ঢুকে পড়ে নিজেকে ধ্বংস করে। এবং সে যে ধ্বংস হচ্ছে তা জানতেও পারেনা। অঁদ্রে জিদ তাই সঠিক কথাই বলেছেন, 'Families, I hate you.'

কুৎসিত হাঁস অপমান ও লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচার জন্যে সংসার বা পরিবার ছেড়ে পালালো। কিন্তু সংসার ছেড়ে পালালেই কি স্বস্তিতে, শান্তিতে বাঁচা যায়? সংসারের বাইরে যে বিশাল পৃথিবী আছে, সেটাও খুব সুখকরনয়। প্রথমেই ঝোপের পাখিরা কুৎসিত হাঁসকে দেখে ভয় পেয়ে পালালো। কারণ হয়ত তার কুৎসিত চেহারা। তারপর কুৎসিত হাঁস উড়ে পালাতে পালাতে এসে পড়লো মস্ত এক বিলে। সেখানে সে সারারাত শুয়ে রইলো। সে তখন ক্লান্ত। তার ওপর মন ভাল নেই। ভোরের দিকে দুটো হাঁস তার কাছে উড়ে এল। তাকে দেখে তারা বলল, 'তুমিতো দেখছি ভারি কুৎসিত! তা, আম

াদের তাতে কিছু যায় আসে না---আমাদের ঘরের কোনো মেয়েকে বিয়ে না করলেই হলো।' কুৎসিত হাঁসের মাথায় তখন বিয়ের ভাবনা নেই। সে তখন চাইছে বাঁচতে। সে চাইছে শান্তিতে থাকতে ।সে বিলের মধ্যে দুটো দিন কাটিয়ে দিল। তারপর এল সেখানে শিকারির দল। দলের সঙ্গে এল এক শিকারি কুকুর।কুকুরটা লকলকে জিভ বের করে, হিংস্র চোখে তাকে দেখল। তবে কিছু বলল না। কুৎসিত হাঁসের মনে হল,'ঈশ্বরের দয়া! আমি এতই কুৎসিত যে আমাকে কামড়াতে কুকুরটার পর্যন্ত ইচ্ছে করেনা।' তারপর সে এই বীপজ্জনকজায়গা ছেড়ে আবার উড়ে পালালো। পালাতে পালাতে এল এক চাষার ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে। সেখানে থাকে এক বুড়ি। আর থাকে এক বিড়াল, এক মুরগি। বুড়ি তাকে দেখে বলল, 'রোজ এখন হাঁসের ডিম খাবো। ব্যাটাছেলে না -হলেই বাঁচিত, সেটা আগে দেখে নিতে হবে।' কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল সে ব্যাটাছেলে। মুরগির মতো তার ডিম পাড়ার ক্ষমতা নেই। এমনকী বিড়ালের মতো পিঠ বাঁকিয়ে গোঁ গোঁ করে আওয়াজ করার ক্ষমতাও তার নেই। সে পারে শুধু জলে সাঁতার দিতে। এটাই তার ভাল লাগে। ফলে এখানেও তার থাকা হলনা। সে আবার এখান থেকে বেরিয়েপড়ল। তবু তার রেহাই নেই। সমস্যা তার পিছু ছাড়ে না। যেখানেই যায়, সেখানেই তাড়া খায়। সবাই তাকে দূর দূরকরে। কারণ একটাই। সে যে কুৎসিত। তারপর একদিন সে দেখতে পেল একঝাঁক রাজহাঁস। কী সুন্দর তাদের গায়ে সাদা রঙ, কী সুন্দর তাদের লম্বা ঘাড়। তাদের দেখে তার ভাল লাগল। শুধু তাই নয়, তাদের ভ ালবেসেও ফেলল।ফেলবেই তো, সে যে তাদেরই একজন। তবে তখনো সে জানেনা, সে তাদেরই একজন, সেও রাজহাঁস, হাঁসেদের রাজা, সে পাতি হাঁস নয়। সে এটা জানল আরো পরে। তার আগে আর একটা বাজে অভিজ্ঞতা হল তার। সে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বরফ হয়ে যাওয়া জলাশয়ের মধ্যে একদিন আটকে গেল। বরফের মধ্যে হিম পরে জমে গেল। এক চাষা তা দেখতে পেয়ে তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এল বাড়িতে। বাড়িতে এসে সে সুস্থ হল। বাড়ির ছেলেপুলেরা তার সঙ্গে খেলা করতে চাইল। সে ভাবল এরা বুঝি তাকে মারবে। সে ভয় পেয়ে উঠে গিয়ে পড়ল একবার দুধের কড়াইতে, একবার মাখনের বাটিতে, একবার খাবারের থালায়। সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতেই গিন্নিঠাকণ চিমটে হাতে তাকে মারতে ছুটে গেল। পোড়াকপালে কুৎসিত হাঁস তখন প্রাণ নিয়ে এই পরিবার থেকে কোনোমতে উড়ে পালালো। তারপর তার মাথার ওপর দিয়ে কাটলো শীত। কাটলো বর্ষা। শেষে এল সুন্দর শরৎ। কুৎসিত হাঁস বিলের মধ্যে গামেলে দিল। এখানেই হল তার নবজন্ম। সে চিনতে পারলো নিজেকে।

।। ছয় ।।

চারপাশে হৃদয়হীন মানুষ, আর তারই মধ্যে প্রাণপণে বাঁচার চেষ্টা। এইরকমই জীবন ছিল এ্যান্ডারসেনের। শুধু এ্যান্ড ারসেনের কেন, সব প্রতিভাবান মানুষদের জীবন কি এইরকম নয়? প্রতিভাবানেরা নমস্য হওয়ার আগে তাদের জীবনে অ াসে হাজারো অপমান ও লাঞ্ছনা। প্রতিভাবানদের জীবনে এ এক অদ্ভুত সমস্যা। সাধারণ মানুষের মধ্যে অসাধারণ হয়ে জন্মানো যেন মস্ত এক অপরাধ, যেন এক ভয়ংকর শাস্তি। প্রতিভাবানদের জীবনের দিকে তাকালে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সত্রেটিসকে হেমলক বিষ পান করতে হয়েছিল, যিশু খ্রীস্টকে ত্রুশবিদ্ধ হতে হয়েছিল। ভগবান মহাবীরকে চোর মনে করে র াজপুষেরা ফাঁসি দিতে গিয়েছিল, চৈতন্যদেবকে মরতে হয়েছিল পাণ্ডাদের হাতে, রামকৃষ্ণকে পরীক্ষার জন্যে মথুরবাবু বেশ্যাদের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন। গ্যালিলিও ধর্মযাজকদের কাছে হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চেয়েছিলেন। আর সেন্ট জোয়ানকে পুড়ি য়ে মারা হয়েছিল। এঁদের পাশাপাশি কবি, লেখক, শিল্পী ও সঙ্গীতস্রষ্টাদের জীবনের দিকে তাকালে আমরা একই ছবি দেখতে পাই। দেখতে পাই সাধারণ মানুষেরা তাঁদের ওপর কী মানসিক অত্যাচারই না করেছে! দান্তে তো প্রাণের ভয়ে ফ্লোরেন্স ছেড়ে পালিয়েছিলেন। শেক্সপীয়রকে রবার্ট গ্রীন বসেছিলেন,'ঠ্র ব্তুল্মাব্দব্ধত্ত্বজব্ধ ত্তুজপ্সভ্র, ন্থুত্ত্বব্ধন্দন্দ্রন্দব্দস্তু ভ্রন্দব্ধড় প্সত্ত্বজ ন্দ্রন্দত্ত্বব্ধড়ন্দত্ত্বজব্দ'. অমর সঙ্গীতস্রষ্টা বাখকে একমাস জেলে থাকতে হয়েছিল। মোৎসার্ট কর্তৃপক্ষের লাথি খেয়েছিলেন। ভ্যান গখ মানসিক যন্ত্রণায় আত্মহত্যা করেছিলেন। এই অত্যাচারের ধারা আজো সব দেশে অব্যাহত অ াছে। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথকে কম অপমান সহ্য করতে হয়নি। শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' পোড়ানো হয়েছিল। জীবনানন্দের কবিতা সাধারণ মানুষের কাছে হাসির খোরাক ছিল। কবি - লেখকরাও তাঁকে তীব্র ভাষায় অ াত্রমণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে শদির ওপর অত্যাচারের কথা সকলের মনে আসবে। আসা স্বাভাবিক। কিন্তু কেন এমন হয়?কেন কবি - লেখকদের ওপর এত হিংসা, কেন এত ত্রোধ? আগে ছিল রাজাদের অত্যাচার, ধর্মযাজকদের অত্যাচার। এখন হয়েছে ধর্মের ধবজাধারীদের অত্যাচার, রাজনৈতিক নেতাদের অত্যাচার। এই সঙ্গে সমালোচকদের নির্মম বাক্যবাণ

তো আছেই। তবে রাষ্ট্র যখন অত্যাচারীর ভূমিকা নেয় তখন তা ভয়ংকর হয়ে ওঠে। রাশিয়া, চিন, নাৎসি- জার্মানি বা কিউবার লেখক ও শিল্পীদের দিকে তাকালে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাশিয়ার সঙ্গীতস্রষ্টা প্রোকোফিয়েভেরসঙ্গীত সম্পর্কে বলা হল, 'স্তন্দ্বন্তুস্তন্দ্ধ ন্দ্রস্জক্ষপ্তনব্দপ্ল', বলা হল, 'ক্কস্তুন্দ্ব ব্ধস্স জন্দ্বন্দ্রপ্তন্দ্বন্তব্ধ ব্ধড়ন্দ্ব ঋক্তজন্দ্বব্ধন্দ্বব্দব্দ স্নন্দ্র স্নত্তজ স্মান্দ্বস্সম্মপ্তন্দ্ব'. আর শোস্তাকোভিচের সঙ্গীত সম্পর্কে প্রাভদায় লেখা হল, 'ত্তত্তস্তুস্তুপ্তন্দ্ব ন্ব্দব্ধন্দ্রস্তু স্নন্দ্র প্লত্তব্দনন্তু'. কিউবার বিখ্যাত লেখক রেনাল্ডো এ্যারেনাস-এর পিছনে কাস্ত্রোর সরকার সিক্রেট পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছিল। তাঁর পাণ্ডুলিপি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। তাঁকে জেলে ভরা হয়েছিল। তারপর তিনি কাস্ত্রোর নির্মম অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্যে আমেরিকায় পালিয়ে গেলেন। আসলে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতারা বিরোধিতা পছন্দ করে না। তারা মনে করে, তারা যা বলবে সেটাই শেষকথা। অপরের স্বাধীনতা হরণ করে নিজেরা স্বাধীনতাভোগ করতে চায়। ফলে বিদ্ধ - মতাবলম্বীদের ধবংস করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাটাই তাদের প্রধান কাজ হয়ে ওঠে। এর জন্যে তারা শুধু ব্যক্তি হত্যা নয়, গণ - হত্যাতেও মেতে ওঠে। লেখকেরা যেহেতু তাদের অবাধ্য হয়,তাদের সমালোচনা করে। সেই কারণে তাদের আক্রোশ প্রথমেই লেখকদের ওপর পড়ে। তাই আমরা সকলেই জানি রাজনৈতিক নেতারা অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ হয়। আমরা জানি তারা খুনি - স্বভাবের হয়, অর্থলোভী হয়, ক্ষমতাপ্রিয় হয়। তারা করতে পারেনা এমন কোনো কাজ নেই। কিন্তু লেখকদের যখন লেখকরাই সমালোচনা করে, তখন কী ভাবে আমরা ? তখন কি ঈর্ষা কাজ করে ? নির্বুদ্ধিতা কাজ করে ? অশিক্ষা কাজ করে ? এর উত্তর দেওয়া মুশকিল। কারণ, ভিক্তর উগোর মত বড় কবি যখন একজনকে স্তাঁদালের 'রেড এ্যাণ্ড' উপন্যাস সম্পর্কে লেখেন, 'ঢ দ্ভন্দ্ব ব্ধক্তজনন্দ্বস্তু ব্ধস্স জন্দ্বস্তু নব্ধস্থ. চত্তব্ধ ড়স্সব্র ভ্রন্দ্বক্তন্দ্ব স্তুস্সত্ত ন্দ্বন্দ্বজ ব্রস্তুন্দ্ব ব্ধস্স স্তুস্ক্ষব্ধন্ত্তন্দ্ব স্তুস্তুস্সস্তু ব্ধড়ন্দ্ব ন্দ্রস্সত্তজব্ধড় স্মন্ত্রন্দ্ব ঞ্জ' তখন আমরা হতবাক হয়ে যাই। উগো মনে করতেন উপন্যাসটি একটি দুর্বল রচনা। শুধু উগো কেন, স্যঁৎ বোভের মতো সমালোচকও স্তাঁদালকে বুঝতে পারেননি। আর অধ্যাপকরা তো স্তাঁদাল সম্পর্কে বলে থাকেন, 'দ্ভস্তু ন্স ব্দব্ধস্তুপ্তন্দ্ব'. বালজাকের কপালেও কম নিন্দে জোটেনি। তাঁর 'ওল্ড গোরিও' সম্পর্কে ১৮৫৩ সালে এক সমালোচক বললেন, 'ন্দ্বব্রস্তুনব্দন্দ্ব ন্স ভ্রস্সপ্ক ব্ধস্স জন্দ্বস্তু ব্ধড়নব্দ স্নপ্তত্তপ্লন্দ্ব.' কারণ উপন্যাসটি 'নপ্লপ্লস্সক্তপ্ত' । এছাড়াও বইটির বিদ্ধে 'জ্বত্তব্ধপ্ত জন্দ্বপ্তনব্দপ্ল' এবং 'প্লব্ধন্দ্বক্তজন্ত্রপ্তনব্দপ্ল' এর অভিযোগ। এখানেই শেষ নয়। বইটির বিদ্ধে 'ন্ত্রন্তস্স স্নন্দ্র প্লস্সস্তুন্দ্বক্তব্ধনস্স্ক্রস্তু স্নন্দ্র প্লন্দ্বব্ধড়স্সস্তু' -এর কথাও বলা হয়েছে। বালজাকের সমকালের অনেকেই তাঁর সম্পর্কে বলেছেন 'ভ্রব্দ ন্স স্তুজন্দ্বব্ধস্সজ' । ফ্লব্যের - এর কপালেও জুঠেছিল এরকমই সমালোচনা। ১৮৫৭ সালে স্যাঁৎ বোভ এক মহিলাকে 'মাদাম বোভারি' সম্পর্কে লিখে জানালেন, 'ঢ স্তুস্স ন্সব্ধব্রস্তুনব্দন্দ্ব স্তুস্সত্ত ব্ধস্স জন্দ্বস্তু ব্ধড়ত্রব্ধ ন্স্মন্দ্বপ্ত. ঢব্ধ নব্দ ব্ধস্সস্স ক্তব্র ন্দ্রস্সজ ব্ধড়ন্দ্ব প্লন্দস্সজনব্ধন্ত স্নন্দ্র ভ্রস্সপ্লন্দ্বব্রস্তু নব্ধ ভ্রস্সত্তপ্তস্তু স্নন্দ্রন্দ্রন্দ্বস্তু স্তুস্সত্তজ ন্দ্রন্দ্বন্দ্বপ্তন্দ্ব্ধব্দ'. একটি পত্রিকায় এক সমালোচক ওই অসামান্য উপন্যাস সম্পর্কে লিখছেন, এই উপন্যাসে সত্য নেই, মৌলিকতা নেই এবং এটা বালজাকের অনুকরণ। আর একজন লিখলেন, 'বড়ন্দ্বক্তন্দ্ব নব্দ ন্দ্বনব্ধড়ন্দ্বক্ত ন্দ্বপ্লস্সব্ধনস্স ন্সজ ন্দ্রন্দ্বন্দ্বপ্তন্দ্ব ন্সজ প্তনন্দ্রন্দ্ব ন্ত ব্ধড়নব্দ ন্স্মন্দ্বপ্ত.' প্রুস্তও এইভাবেই আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর বন্ধুরা তাঁকে বোঝেননি। তিনি কী করে শুদ্ধ ফরাসি লিখতে হয় তা জানেন না বলে তাঁকে সেন্সর করা হয়েছিল। তাঁর গদ্যে নাকি ল্যাটিন ভাষার শৃংখলা, স্পষ্টতা বা ভারসাম্য নেই। তাঁর গদ্য নাকি অপরিচ্ছন্ন। অঁদ্রে জিদের মতো লেখকও বুঝতে পারেননি। ফলে তণ প্রতিভাবান লেখকদের কিছু করার থাকে না। সব সমালোচনাই তাঁদের নীরবে কষ্টের সঙ্গে হজম করতে হয়। তবে সবস্রষ্টা নীরবে সব সমলোচনা সহ্য করেন না। কেউ কেউ সমালোচনার উত্তরে কটূক্তিও করে থাকেন। এক সমালোচক ব্রাম্স্-এর কোনো এক সংগীতের সঙ্গে বিটোফেনের নবম সিম্ফনির সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। ব্রাম্স্ এতে বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'ট্রস্তন্দ্রন্তস্তুন্দ্বব্দব্দ স্তুক্ত ব্দন্দ্বন্দ্ব ব্ধড়ত্রব্ধ.' এই প্রসঙ্গে ক্লোদ দ্যবুসির কথাও বলা যেতে পারে। তাঁর শিক্ষক তঁার সংগীত শুনে বলেছিলেন, 'ঢ'প্ল ন্সব্ধ ব্ধক্তন্ত্ব ব্ধড়ত্রব্ধ ভ্রত্রব্ধ স্তুস্সত্ত স্তুস্স নব্দ'ব্ধ ন্দ্ব্রত্তব্ধনন্দ্রত্তপ্ত, ত্ত্রব্ধ নব্ধ'ব্দ ব্ধড়ন্দ্বস্সক্তন্দ্বব্ধনন্তপ্তপ্তস্তুব্রব্দ্বত্তজস্তু.' এর উত্তরে দ্যবুসি বলেছিলেন, 'বড়ন্দ্বক্তন্দ্ব নব্দ ন্স ব্ধড়ন্দ্বস্সক্তন্ত স্তুস্সত্ত প্লন্দ্বক্তন্দ্বপ্তন্ত দ্ভন্দ্ব ব্ধস্স প্তনব্দব্ধন্দ্ব. ত্নপ্তন্দ্বব্দত্তক্তন্দ্ব নব্দ ব্ধড়ন্দ্ব প্তব্র.' হ্যাঁ, শিল্প - সাহিত্য - সংগীতের এটাই শেষ কথা। তাই সমালোচকদের উচিত নতুন ধরণের লেখকদের বোঝার চেষ্টা করা, আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের উৎসাহিত করা। নিন্দে করা কখনো কোনো সমালোচকের কাজ হতে পারেনা। কিন্তু কুৎসিত হাঁসের মতো কবি - লেখক শিল্পীরা বারবার তাঁদের সমালোচকদের হাতে আক্রান্ত হয়ে আসছেন, ভবিষ্যতেও হবেন। ঘরের অত্যাচারের হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েও তাঁদের শা

ন্তি নেই। বাইরের পৃথিবীটাও বাবা-মা- ভাই -বোন - আত্মীয়স্বজনের মতো সমান হৃদয়হীন। কোথাও এতটুকু ভালবাসা নেই। ঘরে ও বাইরে তাদের সমান অবস্থা।

।। সাত ।।

কোনো মানুষই শিল্পী হয়ে জন্মায় না, সে শিল্পী হয়ে ওঠে। তবে কখন এবং কী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একজন শেক্সপীয়র বা কালিদাস হয় তা বলা সম্ভব নয়। শুধু বলা যায়, শিল্পীর জীবনে আত্ম - আবিষ্কার একটা বড় কথা।যেদিন যে - মূহূর্তে সে নিজেকে চিনতে পারে, নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে, সেদিন সেই মুহূর্ত থেকে সেই শিল্পী হতে শু করে, তার নবজন্ম হয়, বুঝতে পারে, সে আর পাঁচজনের মতো সাধারণ নয়, সে স্বতন্ত্র। কুৎসিত হাঁস নির্যাতিত হতে হতে, অপমানিত হতে হতে একদিন টলটলে জলের বুকে দেখল নিজের ছায়া। সে তখন নিজেকে চিনতে পারল। তারপর সে সমাদৃত হল। সে বুঝতে পারল, বিচ্ছিরি বেঢপ পাখির ছানা সে নয়, সে হাঁসেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সে রাজহাঁস। পাতিহাঁসের উঠোনে জন্মালে কী হবে, সে যে ছিল রাঁজহাঁসের ডিমের মধ্যে। এ্যান্ডারসেনের জীবনও তাই। তাঁর বাবা ছিলেন মুচি, মা ধোপানি। কী যায় আসে তাতে? কারণ, কোথায় কোন পরিবেশে জন্ম হল তা বড় কথা নয়, বড় কথা কর্ম। এই কর্মের জোরেই এ্যান্ডাসেন সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে একজন অত্যন্ত প্রিয় লেখক। একদিন হয়ত সব বিখ্যাত রাজাদের নাম, যোদ্ধাদের নাম, নেতাদের নাম পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যাবে, কিন্তু এ্যান্ডারসেনের নাম কোনোদিন মুছে যাবে না। সব বয়সের মানুষের মধ্যে তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com